IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# Bibhutibhushner Aranyak: Biharer Bhumilagna Jiboner Dalil

**Amit Patra**
Assistant Professor, Haldia Government College

**Abstract:** Bibhutibhushan Bandyopadhyay, one of the prominent writers of Bengali literature in the 1930s, is normally known as a nature-loving author. This love for nature is particularly evident in his novel "Aranyak," set against the backdrop of Bihar. It is true that nature is at the heart of his literature, but he does not create an unrealistic dreamworld as an escape from life. A curious glance reveals not only the mysterious forest nature of Narha, Boihar-Lobtulia, Madhubani, and Mohanpura, but also the daily struggles of the poor forest-dwelling people. The novel is filled with the exploitative relationships between landlords, moneylenders, and tenants, the conflict between wealthy and poor tenants, and the helplessness of farmers and agricultural laborers. In this essay, we have attempted to thoroughly analyze this often-overlooked aspect of Bibhutibhushan Bandyopadhyay's novel "Aranyak."

**মূল প্রবন্ধ-** বিশ শতকের তিরিশি লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতি চিত্রের আধিক্যের জন্য অধিকাংশ সমালোচকই তাঁর গায়ে ‘নিসর্গ প্রেমিক’ লেখকের লেবেল সেঁটে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের এই ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত, তা তাঁর সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে অনুধাবন করা যায়। আসলে প্রকৃতি তাঁর সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করছে একথা সত্য, কিন্তু প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তিনি জীবন-পলাতকের মতো স্বপ্নকল্পনার অবাস্তব নীড় রচনা করেননি; জীবনকে আরও গভীর ও সত্যরূপে অনুধাবন করার জন্যই তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন। ‘তৃণাঙ্কুর’-এ তিনি বলছেন—

> “এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভালো লাগে।”[১]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির মধ্যে বিহারের প্রেক্ষাপটে লেখা একমাত্র উপন্যাস ‘আরণ্যক’ সম্পর্কে তাঁর নিসর্গপ্রীতির কথা বেশি করে শোনা যায়। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসের প্রস্তাবনাতে তিনি নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

> “শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখেছিলাম।- - - কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল- - - ইহাদের কথাই বলিব।”[২]

তাই শুধুমাত্র নাঢ়া বইহার-লবটুলিয়া-মধুবনী-মোহনপুরার রহস্যময় অরণ্য প্রকৃতি নয়, সেইসঙ্গে অরণ্যবাসী দরিদ্র মানুষগুলির দুঃখময় জীবনের রোজনামচাও উঠে এসেছে উপন্যাসে। তবে এর মধ্যে যত না সমাজবদ্ধ মানুষের কথা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সমাজবিচ্ছিন্ন অথবা সমাজের উপান্তে বাসকারী দুঃস্থ, একাকী অথবা উৎকেন্দ্রিক মানুষের কথা। তার সঙ্গে এসেছে এইসব মানুষদের উপর

জমিদার-মহাজন ও তাদের প্রতিহারীদের নিমর্ম শোষণের কাহিনী। সুতরাং বলা যায় অরণ্য আর মানুষের কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে 'আরণ্যক'-এ।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে বিহারের পরিচয় অবশ্য জন্মসূত্রে নয়, কর্মসূত্রে। পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালের ৫০ টাকা বেতনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকুরি নিয়ে ১৯২৪-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ এই ৬ বছর তিনি ভাগলপুর-পূর্ণিয়ায় বসবাস করেছিলেন। জঙ্গল-মহালের বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমির সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল আবলুশ, কেঁদ আর বনকুলের ঘন জঙ্গল। উত্তরদিকে যার বিস্তৃতি পূর্ণিয়া পর্যন্ত। পূর্বে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট। মাঝখানে ফুলকিয়া-বইহার-আজমাবাদের দিগন্তজোড়া জঙ্গল। তারই মাঝখানে ইসমাইলপুরের কাছারি বাড়ী। এই ভাগলপুর-পূর্ণিয়ায় অবস্থানের সময়টাই ছিল লেখক বিভূতিভূষণের আত্মোবিষ্কারের পর্ব। এখানে অবস্থানকালেই তিনি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি লেখেন। এখানে বসবাসের সময়ই তাঁর মাথায় এসেছিল 'অপরাজিত' ও 'আরণ্যক' রচনার পরিকল্পনা। 'স্মৃতির রেখা'য় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারির দিনলিপিতে তিনি লিখছেন—

> "এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো,— একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার — এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। - - - এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি — এইসব।"[৩]

তাঁর অপ্রকাশিত দিনিলিপি-তে 'আরণ্যক' সম্পর্কে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন—

> "A novel on forest"। ওতে নির্জনতার কথা থাকবে, গাছ পালার কথা থাকবে।- - - Forest এর নভেলে জমিদার অর্থবান ও Rich, প্রজা দুঃস্থ ও গরীব – উভয়ের দ্বন্দ্ব, এইটি ফোটাব।[৪]

সুতরাং 'আরণ্যক' এর কাহিনি কাল্পনিক নয়। প্রকৃতি চিত্রের তলে তলে তৎকালীন বিহারের সমাজ-পটভূমির একটা পরিচয় এখানে আছে। যদিও লেখকের নিসর্গপ্রীতি ও সমাজপ্রীতির সাম্যতা এখানে নেই। তার কারণ অবশ্য লেখকের মানসিকতায় সমাজনীতির বিষয়ে একটা ঔদাসীন্য ছিল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যায় লেখকের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও জমিদার আর প্রজার শোষক-শোষিত সম্পর্ক, ধনী প্রজা আর দরিদ্র প্রজার সংঘাত, কৃষক এবং কৃষিমজুরদের অসহায়তা, মহাজনদের সামাজিক অবস্থান উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এখানেই উপন্যাসটির সমাজমূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ অধ্যায়ে জমিদাররা ক্ষয়িত ও বিভক্ত হলেও নতুন জমিদারি কেনার উৎসাহ তখনও তাদের বিন্দুমাত্র কমেনি। কারণ জমিদারী ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধির এমন সহজ পথ আর দুটি ছিল না। ফলে কলকাতার প্রায় সকল ধনীরাই একাধিক জমিদারী কিনে রেখেছিল। কলকাতাতে বাস করেও নায়েব, পাটোয়ারী, তহসীলদার, ইজারাদারদের সাহায্যে খুব সহজেই এই জমিদারী চালানো যেত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী অরণ্য ধ্বংসের দ্বারা উৎপাদিত জমি ও নদী গর্ভ থেকে জেগে ওঠা নতুন চর-জমি বা 'দিয়ারা'র উপরও জমিদারদের ছিল অবাধ অধিকার। ব্রাইনের ১৯১১ সালের 'ভাগলপুর গেজেটিয়ার'-এর বিবরণ থেকে জানা যায় ভাগীরথীর উত্তরে ও পূর্ণিয়া কাটিহারের পশ্চিমে প্রায় দশ হাজার একর জমি গঙ্গা ও কুশীর প্লাবনে তলিয়ে গিয়েছিল। জল সরে যেতেই সেখানে কাঁটা কুল গাছ ও কাশের জঙ্গল গড়ে ওঠে। এরপর ১৯২৪-২৫ সালের বিহার-উড়িষ্যার সার্ভে-সেটেলমেণ্ট বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে দেখি কুশী দিয়ারার ৪৪৫ বর্গমাইল প্রাথমিক বন্দোবস্তের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৬০ বর্গমাইল ভাগলপুরে এবং ৮৫ বর্গমাইল পূর্ণিয়ায়। সম্ভবত এই

অঞ্চলই ছিল খেলাত ঘোষ এস্টেট এর জমিদারী এবং এই জমিরই বিলি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই নায়েব হিসাবে লেখকের এ অঞ্চলে আগমন। আর এখানে কয়েক বছর অবস্থানের ফলে জমি বিলির মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে কীভাবে আবাদ অঞ্চলে পুরো শ্রেণীবিন্যস্ত শোষণপীড়িত সমাজ গড়ে উঠছে তার গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণ 'আরণ্যকে' তুলে ধরেছেন।

জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক সরাসরি কিছু বলেননি। তবে উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্যচরণ জমিদারী সম্পর্কে তাঁর নিজের কর্তব্যের ও জমিদারী বিলিব্যবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই প্রজা নিপীড়নের একটা ছবি আমাদের কাছে উঠে আসে। যেসমস্ত প্রজারা একদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাঁকুরে জমিগুলোকে ঊর্বর করে তুলেছিল, আজ সেইসব দরিদ্র প্রজাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে লাঠির জোরে মোটা টাকা লাভের আশায় জমিদার নতুন প্রজাদের সঙ্গে জমি বিলি-বন্দোবস্ত করছে। তিনি বলছেন—

> "এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল —বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে — কিন্তু যাহারা পিতৃ-পিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এইসব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতেছে। অথচ যে সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অতি দরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা বারবার অনুরোধ উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না। - - -
>
> তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম কোন পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরী করিয়া যায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায় — প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।"[৫]

নতুন প্রজাদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদাই করেই জমিদাররা ক্ষান্ত হয়নি, প্রজা শোষণের নানারকম ফন্দি-ফিকির তারা আবিষ্কার করেছে। লেখক লিখছেন—

> "আমাদের এক ডিহিকাছারী আছে — সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল — এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লবটুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল সেখানেও তেমনি, কেবল সেখানে কাছারী রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতিবছর গোয়ালাদের গোরু মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়।"[৬]

শুধু আবাদযোগ্য জমি থেকেই নয়, অনাবাদী জমি থেকেও মহিষ চরানোর জন্য খাজনা আদায় করা হত। এখানেই শেষ নয়, যেসমস্ত মানুষগুলির পেট ভরানোর একমাত্র উপায় ছিল বন্য কুলের জঙ্গল সেই কুল জঙ্গলও লাক্ষাচাষের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। ঔপন্যাসিক লিখছেন—

> "সেখানে প্রায় দু'তিনশ বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষাকীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুলবন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনার একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারী আছে।"[৭]

কিন্তু পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কেউ যদি দু'চারটে বন্য কুল পাড়ে তাহলে তার কপালে জোটে নিদারুণ যন্ত্রণা। তাছাড়া তার কুল পাড়ার সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত হয়। দরিদ্র প্রজাদের শোষণের এখানেই শেষ নয়, ফসল পাকার পর মহাজন ও জোতদার মিলে জটিলতা পাকায় এবং গরীব চাষীর

ধান বেদখল করে। ঔপন্যাসিক তাঁর বিবরণে গাঙ্গোতা প্রজাদের উপর হাজার বিঘার জমির মালিক ছটুসিং-এর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন—

> "সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছটুসিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন চারশ' বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল দখল করিতে চায়। কাছারির আমলারা বলিল — এ দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।"[৮]

ছটু সিং-এর লাঠিয়াল বাহিনীর লাঠি ও বন্দুকের সঙ্গে দরিদ্র, নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজাদের এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। যদিও পুলিশের ভয় দেখিয়ে সত্যচরণ ছটু সিং-এর বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে কিন্তু পুলিশ এলেও তারা যে ছটু সিং-এর পক্ষ নেবে এ বাস্তব সত্যটি লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্যার মূল কোথায় তা সত্যচরণ সহজেই ধরতে পেরেছে। এক এক জন প্রজা যেখানে ৫ বিঘা – ১০ বিঘা জমি নিতে পারে সেখানে যদি টাকার লোভে কাউকে ১০ হাজার বিঘা জমির মালিকানা দেওয়া হয়, তার সঙ্গে নিরীহ প্রজাদের পেরে ওঠা কঠিন। বিশেষত এই গাঙ্গোতা প্রজারা এত দরিদ্র এদের ঠকানো খুবই সহজ। এরা ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পতিত জমি কম খাজনায় নিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে চাষের উপযুক্ত করে তোলে তারপর খাজনা বাড়লেই দেবার সামর্থ্য থাকে না। তখন আবার খোঁজ নিতে চলে কোথায় সস্তায় জমি বিলি হচ্ছে। কিন্তু নতুন জমির কারণে এদের এই যে যাত্রা সে তো আসলে বঞ্চনারই ফল। কারণ হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অনাবাদী জমিকে তারা আবাদী করে তোলে সেই জমিকে তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এর মূলে কি বিত্তশালীর লাঠির জোর নেই?

কৃষকদের শোষণের দৌড়ে ছটুসিং একা নয়, তাকে সাহায্য করতে আসে জোতদার রাসবিহারী সিং ও মহাজন নন্দলাল ওঝা। তার ফলে দরিদ্র প্রজাদের প্রতিবাদ বালির বাঁধের মতো ভেসে যেত। জোতদার রাসবিহারী সিং এর প্রজাশোষণের সরাসরি কোনো চিত্র উপন্যাসে নেই। তবে ঔপন্যাসিক রাসবিহারী সিং-এর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে প্রজাদের অসহায়তার চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখছেন—

> "এ-অঞ্চলের যত গরীব গাঙ্গোতা-জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরীবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া হাজির করিবে।"[৯]

রাসবিহারী সিং এর এই ক্ষমতার পিছনে আছে সরকারি কর্মচারীদের মদত। খাসমহলের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার প্রায়ই রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে। ফলে দরিদ্র প্রজাদের শোষিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

কৃষিজীবী মানুষগুলির জীবনচিত্রের সঙ্গে বিহারের ফসল-কাটা মুজুরদের যাযাবর জীবনের প্রত্যক্ষ চিত্র 'আরণ্যক'-এর পাতায় উঠে এসেছে। নুন দিয়ে চীনা ঘাসের দানা সেদ্ধ আর বেথো শাক দিয়ে এরা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করে। বিহারের ভয়ঙ্কর শীত থেকে রক্ষা পেতে কলাইয়ের ভুসিই ছিল তাদের একমাত্র উপায়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা যে ফসলের ভাগ পেত তা চলে যেত আড়তদার ও ফেরিওয়ালাদের কবলে। নক্ছেদী ভকত মজুরি বাবদ আট-দশ মণ সর্ষে পেয়েছিল। কিন্তু মঞ্চী আয়না, মাথার কাঁটা, চিরুনি, ঝুটো পাথরের আংটি, চীনামাটির পুতুল, সাবান, লাল ফিতে, পুঁতির হার এইসব সস্তা জিনিস চারগুণ বেশি দাম দিয়ে কিনে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনমণ সর্ষে খরচ করে ফেলেছে। তহসিলদার ও গোমস্তারাও এই মজুরিতে ভাগ বসাত। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হয়ে আবার তাদের যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করতে হত, যেতে হতো অন্য কোথাও অন্য কোনো ধরণের

ফসল কাটতে। সুতরাং দেখা যায় প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত, একমুঠো ভাত খাওয়ার লোভে যারা দশ-বারো মাইল বিনা নিমন্ত্রনে ছুটে আসে পরতে পরতে তাদের চিত্র উঠে এসেছে। প্রকৃতি মুগ্ধতা সরিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই জমিদার–মহাজন-জোতদারদের কৃষক ও কৃষিমজুরদের নির্মম শোষণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:


1. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী- ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৬১, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা- ১৭৬।
2. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী- ৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬৩, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা- ৩-৪।
3. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী- ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬০, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা- ৪১৭।
4. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়(সম্পা), বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি (১৯৩৩, ৩৪ ও ৪১), নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৬০, কলকাতা-৭১, পৃষ্ঠা-২২৫।
5. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী-৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬৩, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা-১২-১৩।
6. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩।
7. তদেব।
8. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৩।
9. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৬।


সহায়ক গ্রন্থঃ


1. কিশলয় ঠাকুর, পথের কবি, আনন্দ, জুলাই ২০১৪, কলকাতা-৪।
2. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী-১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬৩, কলিকাতা-১২।
3. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি-রচনাবলী-৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৬৩, কলিকাতা-১২।
4. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি (১৯৩৩, ৩৪ ও ৪১), নাথ ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৬০, কলকাতা-৭১, পৃষ্ঠা-২২৫।
5. তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক নানা চোখে, প্রজ্ঞাবিকাশ, আগস্ট ২০১২, কলকাতা-৭৩।
6. সমরেশ মজুমদার (সম্পা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক, জে এন ঘোষ অ্যান্ড সন্স, সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা-৭৩।
7. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি-২০১৬, কলকাতা-৭৩।
8. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি-২০১২, কলকাতা-৭৩।
9. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণঃমন ও শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল-২০১৬, কলকাতা-৭৩।
10. কমল মুখোপাধ্যায় (সম্পা), বিভূতিভূষণঃ শতবর্ষের সমীক্ষা, শিলীন্ধ্র প্রকাশন, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা-৯০।


International Research Journal
Research Through Innovation